২০ টাকা

নিবোধত

পূজাসংখ্যা

৩৫ বর্ষ ★ ৩য় সংখ্যা
সেপ্টেম্বর - অক্টোবর ২০২১

শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রকাশিত ধর্মীয় পত্রিকা

Scanned by CamScanner

বাতায়ন

কলকাতার 'রামকৃষ্ণ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান'টি :
কিছু সংবাদ কিছু স্মৃতি ২২৭
স্বামী বলভদ্রানন্দ

'কীভাবে ভজিব তোমায়' ৩৭৩
দেবব্রত কবিরাজ ঠাকুর

মার্শাল আর্টের জনক
বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বোধিধর্ম
৩৭৮
কুণাল চট্টোপাধ্যায়

কবিতাবলি ২৬০
অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়
বলদেব দাস
শ্রীনিবাস অধিকারী
মৌসুমী বসু
অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়
বীথি মুখোপাধ্যায়

পথের টানে

হিমালয়পথে :
তমসা উপত্যকা ও অচেনা হানোল ৩৮৩
সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমহাবোধির দেশে ৩৫১
অরিন্দম চক্রবর্তী

ভ্যাল থোরেন্সের
অভিজ্ঞতা ৩২৩
রাজর্ষি পাল

নিয়মিত বিভাগ

সঙ্ঘসংবাদ ৩৮৮

Scanned by CamScanner

শ্রীমহাবোধির দেশে

অরিন্দম চক্রবর্তী

কলম্বোর বন্দরনায়েকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমাদের বিমান যখন ল্যান্ড করল তখন রাত দেড়টা। আক্ষরিক অর্থেই মাঝরাত। ইমিগ্রেশনে লম্বা লাইন। সেখানে প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগল ভিসার প্রয়োজনীয় কাজ সারতে। সেখান থেকে বেরিয়ে ডলারগুলি শ্রীলঙ্কার টাকায় পরিবর্তিত করতেই মানিব্যাগটা স্ফীত হয়ে উঠল। এরপর সকালের জন্য অপেক্ষা। দুদিনের একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দিতে এসেছি। সেইসূত্রে চারপাশটা একটু ঘুরে নেওয়া আর শ্রীলঙ্কার সংস্কৃতিকে একটু চাক্ষুষ করা—এই উদ্দেশ্য। সকালে সেমিনার কর্তৃপক্ষ গাড়ি পাঠাবেন। কলম্বো থেকে বিশেষ কেউ যাবেন সেমিনারে বক্তব্য রাখতে। তাঁর সঙ্গে আমাকেও তুলে নেবেন। দেখছি একের পর এক বিমান নামছে আর বিদেশিদের সংখ্যা বাড়ছে। বেশিরভাগই চিনা ও জাপানি।

সকাল সাতটায় আমরা রওনা হলাম মিহিনতালের উদ্দেশে। আমার সঙ্গী ড. ফ্রেডরিক অ্যাবেরত্নে, ইউএনডিপির শ্রীলঙ্কা শাখার পভার্টি-গভর্ন্যান্স বিভাগের প্রাক্তন প্রধান। আমি গাড়িতে উঠতেই নিজের পরিচয় দিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। মিষ্টভাষী সুন্দর মানুষ। কথায় কথায় জেনে নিলেন কোথা থেকে আসছি, সেমিনারে কোন্ বিষয়ে পেপার প্রেজেন্ট করব ইত্যাদি ইত্যাদি। আমিও প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে গল্প জুড়ে দিলাম।

কলকাতা থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছি। পেরিয়েছি মহাসাগরও। কাজেই একটু বিদেশি পরিমণ্ডলের প্রত্যাশায় বাইরে চোখ রাখলাম। কিন্তু কোথায় কী! কলম্বো ছেড়ে গাড়ি এগোতেই অবাক হলাম। আরে এ তো এক্কেবারে পশ্চিমবঙ্গ! সেই গাছগাছালি, সেই ভূপ্রকৃতি। এত মিল! একসময় ক্যানভাস পালটে গেল। এবার কেরল। সারি সারি নারকেল গাছ। তার মাঝে ইতিউতি ঘরবাড়ি। বাড়ির ছাদগুলি দোচালা, কোথাও চারচালা। সাধারণত যেখানে বরফ পড়ে সেখানে এরকম ছাদ দেখা যায়। অ্যাবেরত্নে জানালেন, "শ্রীলঙ্কায় প্রচুর বৃষ্টি হয়। জল জমে ছাদ যাতে নষ্ট না হয় তাই ঢালু ছাদের চল।"

এক জায়গায় গাড়ি দাঁড়াল প্রাতরাশের জন্য। স্থানীয় মহিলারা বিভিন্ন খাবার নিয়ে বসেছেন। তার মধ্যে নুডলসটাই আমার চেনা লাগল। চাইতেই একটা পাতায় কিছু নুডলসের উপর একটু তরকারি ছড়িয়ে দিলেন। খুব স্বাদু যে লাগল তা নয়। তবে

Scanned by CamScanner

একটু ভিন্ন স্বাদের নুডলস খাচ্ছি অন্য দেশে এসে—এই ব্যাপারটা উপভোগ করার চেষ্টা করলাম। খাওয়া শেষে আবার রওনা। এখন আমাদের প্রায় দুশো কিলোমিটার পথ পেরোতে হবে। জনমানবহীন ঝকঝকে রাস্তা দেখে ভেবেছিলাম আশি থেকে একশো কিলোমিটার বেগে গাড়ি চলবে, তিন-সাড়ে তিন ঘণ্টায় পৌঁছে যাব। কিন্তু ড্রাইভারকে ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটারের বেশি গতি বাড়াতে দেখলাম না। যেন কোনও তাড়া নেই। শুধু অবাকই হইনি, মনে অনেক প্রশ্নও জেগেছিল, যার উত্তর পেয়েছিলাম ফেরার দিন।

মিহিনতালে শ্রীলঙ্কার উত্তর-মধ্যভাগে অবস্থিত। অ্যাবেরত্নে বলছিলেন, "শ্রীলঙ্কার এই অংশটি শুখা অঞ্চল বলে পরিচিত। তুলনামূলকভাবে এখানে বৃষ্টি কম হয়।" আমি আমাদের দেশের বা রাজ্যের তথাকথিত শুখা অঞ্চলগুলির সঙ্গে একটা তুলনা করার চেষ্টা করলাম। চারদিকে মাঠঘাট এত সবুজ যে আমার ধারণার শুখা অঞ্চলের সঙ্গে কোনও মিলই পেলাম না। মিহিনতালেতে ঢোকার মুখে একটি বিরাট জলাধার। চারদিক বেশ সুন্দর করে বাঁধানো। অ্যাবেরত্নে জানালেন, "এটাই শ্রীলঙ্কার সব থেকে বড় মনুষ্যসৃষ্ট জলাধার। শুখা মরশুমে এ-অঞ্চলের মানুষ এই জলাধারের জলের উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।"

বেলা বারোটায় হোটেলে পৌঁছলাম। আরও অনেকে ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছেন। অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাই আধঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি এল আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। হোটেল থেকে এক কিলোমিটার পথ। মিহিনতালের রাজারাটা বিশ্ববিদ্যালয়। আশেপাশে লোকবসতি খুব বেশি নয়। খানিকটা মফঃস্বল গোছের। বেশ ছিমছাম ক্যাম্পাস। ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে। অধ্যাপকেরা ভীষণ আন্তরিক ও মৃদুভাষী। নিজে থেকে এগিয়ে এসে আলাপ করে কুশল জিজ্ঞাসা করছেন, অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। সকলে এত মৃদুকণ্ঠে কথা বলছিলেন যে নিজের কণ্ঠস্বরকে ভীষণ বেমানান লাগছিল।

প্রথম দিন সেমিনার শেষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিরাট সুইমিং পুলের পাশে আয়োজন করা হয়েছিল কমপ্লিমেন্টারি ডিনারের। সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত চলেছিল এ-পর্ব। সঙ্গে স্থানীয় সংগীতের সঙ্গে দেশজ নৃত্য পরিবেশন। একটি দেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য এর থেকে পরিপূর্ণ প্যাকেজ আর কী হতে পারে! একটি অ্যাকাডেমিক সফরে এসে এভাবে সাংস্কৃতিক পরিচয় লাভের সুযোগ পেয়ে খুবই ভাল লাগল। বুফেতে খাওয়ার আয়োজন থাকলেও আমাদের সঙ্গী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মহেসিকা বারবার বলছিলেন, 'মনিয়ক্কা' দিয়ে শুরু করতে।

'মনিয়ক্কা' এখানকার বিশেষ খাবার, মূলত আলু দিয়ে তৈরি। বেশ ভাল খেতে। টেবিলে আরও অনেক খাবার সাজানো। কিছু পরিচিত কিছু অপরিচিত। মূল খাদ্য অবশ্যই ভাত। পাশাপাশি একাধিক রকমের নুডলস, পোলাও। এছাড়া বিভিন্ন সবজি, মাংস এবং বেশ কয়েক রকমের ফল। আমাদের এখানে যেমন ধোসা তেমন ওখানে হোপারস। অনেকটা ধোসারই মতন। বিবিধ তরকারির পদের মধ্যে চিলিপেস্ট (লঙ্কাবাটা দিয়ে বানানো) দেখে প্রথমে একটু অবাকই হয়েছিলাম। এ আবার কেমন পদ! কিন্তু ফেরার দিন সিগিরিয়াতে খেতে গিয়ে লঙ্কা-আলুভাজা, শুকনো লঙ্কাভাজা প্রভৃতি পদ দেখে বুঝেছিলাম এখানকার মানুষ ঝাল খেতে বেশ পছন্দ করেন। এটি এঁদের সংস্কৃতির অঙ্গ।

দ্বিতীয় দিন সেমিনার শেষ হতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম অনুরাধাপুরার উদ্দেশে—মিহিনতালে থেকে ষোলো কিলোমিটার দূরে। চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে একাদশ খ্রিস্টাব্দের সূচনালগ্ন

জেতবন স্তূপ

পর্যন্ত এটি ছিল তৎকালীন সিংহলের মূল রাজধানী শহর। শ্রীলঙ্কায় যে-আটটি ইউনেস্কোর হেরিটেজ স্পট রয়েছে তার মধ্যে অনুরাধাপুরা একটি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করেছেন। গাড়িতে আমরা ভারত থেকে আসা পাঁচজন, এছাড়া আমাদের সঙ্গী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রুমেশ এবং একজন গাইড। অনুরাধাপুরায় পৌঁছে প্রথমেই আমাদের গাইড টিকিট কেটে দিলেন। সব স্থান দেখার জন্য একটিই টিকিট। শ্রীলঙ্কার মুদ্রায় জন প্রতি আঠারোশো টাকা। শুরু করলাম জেতবন স্তূপ দিয়ে।

মহাসেনা রাজার শাসনকালে (২৭২-৩০৩ খ্রিস্টাব্দ) এই স্তূপ বা জেতভারারামায়ার নির্মাণ শুরু হয়। এখানে একসময় একটি বৌদ্ধ মহাবিহার ছিল। সেটিকে ধ্বংস করে রাজা মহাসেনা এটি তৈরির উদ্যোগ নেন। কিন্তু শেষ করতে পারেননি। পরবর্তী কালে তাঁর পুত্র মাঘভান্না (প্রথম) এটির নির্মাণ সমাপ্ত করেন। এরপর একাধিক রাজার রাজত্বকালে এর সংস্কারসাধন হয়। সেসময় দশ হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এখানে থাকতেন।

এর বাস্তুরীতি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তখন এটি ছিল পৃথিবীর উচ্চতম স্তূপ। চারশো ফুট। কিন্তু একাদশ খ্রিস্টাব্দের প্রথমদিকে অনুরাধাপুরা সাম্রাজ্যের অবসানের পর এটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা পরাক্রমবাহু (প্রথম) সংস্কার করে বর্তমান স্তূপটি নির্মাণ করেন। এখন স্তূপটির উচ্চতা ২৩৭ ফুট। এখন আর উচ্চতম না হলেও, এটি পৃথিবীর বৃহত্তম স্তূপ হিসেবে পরিগণিত। ৯ কোটি ৩৩ লক্ষ ইট দিয়ে এটি তৈরি হয়েছিল। স্তূপটির গঠনশৈলী, প্রত্নতাত্ত্বিক সৌন্দর্য অনবদ্য। আমরা পুরো চত্বরটা ঘুরে দেখছি। গাইড একের পর এক বর্ণনা করে যাচ্ছেন। স্তূপনির্মাণে অর্থদানকারীদের নাম পাথরের উপর খোদিত আছে। সংলগ্ন মন্দিরের দেওয়ালে তৎকালীন রাজাদের দণ্ডায়মান মূর্তি রয়েছে। আর মূল গর্ভগৃহে রয়েছে গৌতমবুদ্ধের শায়িত মূর্তি। কাচের বাক্সে যে-কোমরবন্ধনীর অংশ রক্ষিত আছে তা স্বয়ং গৌতমবুদ্ধ ব্যবহার করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। চতুর্দশ খ্রিস্টাব্দে রাজারাটা সাম্রাজ্যের পতনের পর এই স্তূপটি আগাছায় চাপা পড়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ব্রিটিশ কর্তৃক এর পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ ঘটে। এখন শ্রীলঙ্কা সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ দ্বারা এটি সংরক্ষিত।

এরপর অভয়গিরি। এখানে রয়েছে সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত টুইন পন্ডস বা কুট্টাম পকুনায়। মূলত বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের স্নানের জন্য এই পুকুর দুটি ব্যবহৃত হত। উত্তর দিকের পুকুরটি লম্বায় ৯১ ফুট আর দক্ষিণেরটি ১৩২ ফুট। কীভাবে বৃষ্টির জল পরিশোধিত হয়ে পুকুরদুটিতে পড়ত এবং সারা বছর জলস্তর একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় থাকত সে-বাস্তুরীতি সত্যিই বিস্ময়ের। তারপর একে একে দেখলাম পঞ্চম শতাব্দীর মৈত্রী বোধিসত্ত্বমূর্তি ও বোধিবৃক্ষ শ্রাইন, সপ্তম শতাব্দীর শিল্পকলায় সমৃদ্ধ গার্ডস্টোন ও মুনস্টোন এবং আরও কিছু

ঐতিহাসিক স্থান। প্রতিটি স্থানে খুঁজছি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আর গাইড একের পর এক ইতিহাস উন্মোচন করে চলেছেন। অধিকাংশই ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু গাইডের কথা শুনে মনে হচ্ছে আমরা ফিরে গিয়েছি দুহাজার বছর আগে। কীভাবে বৌদ্ধরা জীবন কাটাতেন, শিক্ষাগ্রহণ করতেন, কীভাবে প্রত্যেককে দৈনন্দিন কাজে অংশ নিতে হত, যারা অপরাধ করত তাদের কোথায় কীভাবে রাখা হত, কীভাবে তাদের সংশোধনের মাধ্যমে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা হত—ইতিহাস পাতা উলটে চলেছে, আমরা মন্ত্রমুগ্ধ দর্শক-শ্রোতা!

কুট্টাম পকুনা

চলতিপথে পড়ল একটি মিউজিয়াম। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। তাছাড়া এখনও আমাদের দু-তিনটি বিশেষ স্থান দেখা বাকি। তাই আর মিউজিয়ামের ভিতরে ঢোকা হল না। এগিয়ে চললাম রুয়ানওয়েলিসায়া স্তূপের দিকে। শ্রীলঙ্কার প্রাচীনতম স্তূপ। মহানামার 'মহাবংশ'তে গৌতমবুদ্ধের তিনবার শ্রীলঙ্কায় আসার উল্লেখ আছে। তিনি এখানে যে যে-স্থানে গিয়েছিলেন এই স্তূপের জায়গাটি তার মধ্যে একটি। তাই রুয়ানওয়েলিসায়া সারা পৃথিবীর বৌদ্ধদের কাছে এক পবিত্র স্থান। এই স্তূপটি নির্মাণ শুরু হয়েছিল ১৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রাজা দুতুগেমুনুর সময়ে। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর ভাই সাদ্দাথিসা নির্মাণ সম্পূর্ণ করেন। পরবর্তী কালে বিভিন্ন রাজার রাজত্বকালে এর সংস্কার হয়। স্তূপটি 'মহাথুপা' বা 'রত্নামালি দাগাবা' নামেও পরিচিত। উনবিংশ শতাব্দীতে এটি প্রায় ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়। শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধভিক্ষুরা বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থের ব্যবস্থা করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমে এটির সংস্কারসাধন করেন। ১৯৪০ সালে এর চূড়ার কাজ সমাপ্ত হয়। তৈরির সময় এর উচ্চতা ছিল ১৮০ ফুট। এখন ৩৩৮ ফুট। মায়ানমারের কুংমুডা প্যাগোডা এর অনুকরণে তৈরি।

সন্ধ্যা নেমেছে। স্তূপের প্রবেশপথের একপাশে একটি বড় ঘরে সারি সারি প্রদীপ রাখা। সবাই প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন। প্রদীপের মৃদু আলো বুদ্ধের আলোকপ্রাপ্ত অবস্থাকে প্রতীকায়িত করে। হাজার হাজার প্রদীপের মৃদু আলোকচ্ছটা এক মায়াবি পরিবেশ তৈরি করেছে। আমরা তার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলেছি। স্তূপের চারপাশে বিরাট চত্বর। গাইড জানালেন, "বুদ্ধপূর্ণিমা এখানে খুব পবিত্রভাবে পালিত হয়। রাতে হেলিকপ্টার থেকে এখানে পুষ্পবৃষ্টি করা হয়। গোটা চত্বর ফুলে ফুলে ভরে ওঠে। সে এক ঐশ্বরিক মুহূর্ত!"

আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছি গোটা চত্বর। বিভিন্ন রঙের ছোট ছোট 'প্রেয়ার-ফ্ল্যাগ' উড়ছে। এগুলি শান্তি, জ্ঞান, করুণা ও মানসিক শক্তির বার্তা বহন করে। এক জায়গায় কিছু মানুষ সমবেত হয়ে খুব মৃদুস্বরে কিছু পাঠ করছেন। পাশ কাটিয়ে আমরা মূল মন্দিরে প্রবেশ করলাম যেখানে ছোট ছোট বুদ্ধমূর্তির পাশাপাশি শায়িত বুদ্ধের বিশাল মূর্তি রয়েছে। মূর্তিটি সত্যিই মনোমুগ্ধকর, এক অতীন্দ্রিয় চেতনায় আবিষ্ট করে। এই মূর্তির সামনে দাঁড়ালে হাত দুটো স্বতই বুকের কাছে উঠে আসে প্রণামের ভঙ্গিতে। শরীরে মনে এক স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ে। বিগ্রহের সামনে সবাই ফুল দিয়ে, ধূপ জ্বালিয়ে

প্রার্থনা করছেন। চারিদিকে এক স্বর্গীয় শান্তি বিরাজমান। কোনও অকারণ শব্দ নেই। এত মানুষ, কিন্তু চারিদিকে এক ধ্যানমগ্ন নীরবতা। বুঝলাম এই শব্দবিহীন আত্মনিবেদন, এই নীরব প্রার্থনা—এই ধর্মীয় মূল্যবোধই এদের মৃদুভাষী করেছে।

স্তূপ থেকে খানিকটা হেঁটে সামনে এগোতেই বাঁদিকে পড়ল ব্রাজেন প্যালেসের ধ্বংসাবশেষ। এর ছাদ ব্রোঞ্জের টালি দিয়ে মোড়া ছিল বলে এমন নামকরণ। রাজা দুতুগেমুনুর (খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ অব্দ—১৩৭ অব্দ) সময়ে নির্মিত এই ব্রাজেন প্যালেস বা লোভামাহাপায়া ছিল নয়তলা, চারশো ফুট লম্বা, মোট ষোলোশো স্তম্ভের উপর নির্মিত। এটি নির্মাণ করতে ছ-বছর লেগেছিল। ভিক্ষুদের থাকার জায়গা ছিল এটি। এর উপাসনাগৃহে তাঁরা প্রতি পূর্ণিমারাতে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করতেন। রাজা সাদ্দাথিসার সময়ে একটি অগ্নিকাণ্ডে এটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। তিনি আবার এটি নির্মাণ করেন। নবনির্মিত লোভামাহাপায়া সাততলা। ১৫৫ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ—এই সময়ে এটি ছিল শ্রীলঙ্কার সবথেকে উচ্চতম বাড়ি। পরে এটি আবারও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অন্ধকার হয়ে এল। সেই অন্ধকারে দেখলাম কেবল কিছু খাড়া খাড়া পাথর ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই ইতিহাসকে পেছনে ফেলে আমরা চললাম বোধিবৃক্ষের দিকে।

বোধিবৃক্ষ বা শ্রীমহাবোধি! কথিত যে, এখানকার বোধিবৃক্ষটি বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষের দক্ষিণাংশের শাখা, যা ২৮৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এনে লাগানো হয়েছিল। এটি পৃথিবীর সবথেকে প্রাচীন মনুষ্যরোপিত বৃক্ষ। দুহাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন এক ঐতিহাসিক বৃক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল। বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ!

অনুরাধাপুরার ঐতিহ্য যে, কৃষকেরা তাদের নতুন ধানের অন্ন শ্রীমহাবোধির উদ্দেশে নিবেদন করেন। তাঁদের গভীর বিশ্বাস, এই নিবেদন তাঁদের শস্যকে সবরকম ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবে। সন্তান জন্মের আগে বাবা-মায়েরা এখানে এসে প্রার্থনা করেন যাতে সুস্থ, সুন্দর সন্তান পৃথিবীতে আসে। গাইড দেখালেন শ্রীমহাবোধির চত্বরে পাথর দিয়ে বেশ উঁচু পাঁচিল তোলা রয়েছে যাতে জন্তুজানোয়ার, বিশেষত হাতি এসে এর ক্ষতি করতে না পারে। দুহাজার বছরের প্রাচীন বৃক্ষ যাতে প্রাকৃতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাই প্রতিটি শাখার নিচে শক্ত কাঠকে অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ-উদ্দেশ্যে সমশ্রেণির একাধিক গাছ ওই চত্বরে লাগানো হয়েছে। এ তো শুধু একটি গাছ নয়, সুগভীর ধর্মীয় চেতনার এক ভাস্বর প্রতিমূর্তি। তাই তাকে সুরক্ষিত রাখার সবরকম ঐকান্তিক প্রয়াস।

আমরা দেখলাম শ্রীমহাবোধির লাগোয়া চত্বরে সকলে প্রার্থনা করছেন, প্রণাম করছেন। নীরব নিবেদন। প্রতিটি মানুষের পরনে সাদা পোশাক। মনে পড়ল শ্রীমহাবোধির প্রবেশপথে ঢুকতেই ডানহাতে একটি ফলকের উপর লেখা ছিল, "As a form of respect, kindly dress in white at this sacred venue." এখানকার সবকিছুই এক চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলায় বাঁধা।

ফিরে চললাম মিহিনতালের উদ্দেশে। মাঝপথে গাইড নেমে গেলেন। এরপর আমাদের দ্রষ্টব্য মিহিনতালে রক। চারদিকে তখন ঘন অন্ধকার। তবুও আমাদের উৎসাহ দেখে রুমেশ নিয়ে গেল রকে। অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় আমরা রকে উঠিনি। সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতে আসার প্রতিশ্রুতি রেখে হোটেলে ফিরলাম।

সারাদিন অনেক ধকল গেছে। ঘরে ফিরে ফ্রেশ হয়ে ওয়েটারকে মেনুকার্ড আনতে বললাম। তাতে দেখি দুরকম মাছের নাম—সি ফিশ আর সুইট

Scanned by CamScanner

ওয়াটার ফিশ অর্থাৎ স্থানীয় মাছ। ভাবলাম স্থানীয় মাছ খেলে এখানকার মাছ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। সেইমতো অর্ডার দিলাম। খেতে বসে অবাক হয়ে দেখি পাতে প্রমাণ সাইজের একটি তেলাপিয়া—যা আজ দুপুরে টুইন পন্ডসের জলে অনেক ভাসতে দেখেছি। ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করায় জানাল, মাছটির নাম 'তেলপিয়া।' বুঝলাম বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে মাছটি শুধু নামই পালটায়নি নিজের জাতও পালটে ফেলেছে, নাহলে এমন একটি হোটেলে বিদেশিদের পাতে কিনা দেওয়া হচ্ছে সুইট ওয়াটার ফিশ 'তেলপিয়া'!

পরদিন সকালে প্রাতরাশ করতে গিয়ে হোটেলের মালিক রঞ্জিত মেডিসের সঙ্গে কথা বলছিলাম। মিষ্টভাষী ভদ্রজন। এর আগেও কয়েকবার কথা হয়েছে। জানালাম, "গত দুদিনের অভিজ্ঞতায় আমার মনে হয়েছে এ-অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে এক সুগভীর ধর্মীয় মূল্যবোধ রয়েছে, যা মানুষকে শান্ত, স্নিগ্ধ ও ঈশ্বরমুখী করে। ফলে সামাজিক অপরাধ এখানে কম হবে বলেই আমার বিশ্বাস।" তিনি সায় দিয়ে জানালেন, এখানকার মানুষজন খুবই শান্তিপ্রিয়। সামাজিক অপরাধ এখানে নেই বললেই চলে। গত কয়েক বছরে একটি ছোটখাট চুরি ছাড়া আর কোনও অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে তাঁর জানা নেই। আমার দেশের সঙ্গে এ-স্থানের তুল্যমূল্য বিচারে মন আর সায় দিল না। এরপর প্রাতরাশ সেরে যখন ঘরে ফিরছি রঞ্জিত মেডিস আমার হাতে একটি ছোট্ট মেমেন্টো দিয়ে বললেন, "এটি আমার তরফ থেকে আপনার জন্য স্মরণিকা। এরপর পরিবার নিয়ে একবার আসবেন। আগে থেকে আমাকে শুধু একটা ফোন করে দেবেন। ব্যাস! গোটা শ্রীলঙ্কা ঘুরিয়ে দেখাব, জাফনা, ত্রিকোনমালি, মান্নার—সব। দেখবেন কত সুন্দর আমাদের দেশ!"

এবার দেশে ফেরা। আজ সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার। চলেছি সিগিরিয়ার উদ্দেশে। আর একটি ইউনেস্কো হেরিটেজ স্পট। মিহিনতালে থেকে সত্তর কিলোমিটার। জাপানি টয়োটা আমাকে সিগিরিয়া ঘুরিয়ে কলম্বোর বন্দরনায়েকে বিমানবন্দরে নামিয়ে দেবে। বিনিময়ে দিতে হবে শ্রীলঙ্কার মুদ্রায় কুড়ি হাজার টাকা।

ড্রাইভার বছর আঠাশ-তিরিশের ফ্যাশান-দুরস্ত এক যুবক। আমি যে 'সাজি সামি' হোটেলে ছিলাম সেই হোটেল মালিকের ছোট ছেলে সামি। আজও ফাঁকা, জনহীন রাস্তা কিন্তু গাড়ি চলছে সেই ধীর গতিতেই। কৌতূহলী হয়ে সামিকে প্রশ্ন করে ভারি অদ্ভুত উত্তর পেলাম। রাস্তার পাশে কিছুদূর পর পর বিভিন্ন গাড়ি সর্বোচ্চ কত কিলোমিটার বেগে যাবে তার একটা তালিকা দেওয়া আছে। আমরা যে-গাড়িতে যাচ্ছি তার সর্বোচ্চ বেগ হবে ষাট কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। এবার বুঝলাম আসার দিন গাড়ি কেন অত ধীরগতিতে চলছিল। ড্রাইভার যুবক বা প্রৌঢ়, গাড়ি দেশি বা বিদেশি, রাস্তা জনহীন বা জনপূর্ণ, রাস্তায় পুলিশ থাকুক বা না থাকুক—গাড়ি বিধিবদ্ধ বেগের ওপরে যাবে না। এক প্রাচীন সামাজিক চেতনা, এক গভীর ধর্মীয় মূল্যবোধ ওদের এই শিক্ষাই দেয়।

বেলা এগারোটায় সিগিরিয়ায় পৌঁছলাম। সিগিরিয়া বা সিংহগিরি বা লায়ন রক। শ্রীলঙ্কার মুদ্রায় চব্বিশশো টাকা দিয়ে টিকিট কেটে প্রবেশ করলাম। ডানহাতে ছোট একটি মিউজিয়াম যেখানে দুহাজার বছরের ইতিহাস সযত্নে রক্ষিত। মিউজিয়ামের ভিতরে পাথুরে দেওয়ালের গায়ে উৎকীর্ণ ফ্রেসকোর কাজ দেখার মতন। সিগিরিয়ার চিত্রকলা শ্রীলঙ্কার ধ্রুপদি কলাগুলির অন্যতম। কেবল প্রাচীন চিত্রকলা নয়, মিউজিয়ামের এক ঘর থেকে আর এক ঘর—প্রতি ইঙ্গিতে কেবল ইতিহাস। সিগিরিয়া খ্রিস্টপূর্ব প্রথম-দ্বিতীয় শতকের বৌদ্ধ মঠ। শ্রীলঙ্কার প্রাচীন গ্রন্থ 'কুলবংশ' অনুসারে পঞ্চম

শতাব্দীতে রাজা কাশ্যপ (প্রথম) সিগিরিয়াকে রাজধানী হিসেবে নির্বাচন করেন এবং প্রশাসনিক কেন্দ্র অনুরাধাপুরা থেকে সিগিরিয়ায় স্থানান্তরিত করে এখান থেকে রাজ্যশাসন শুরু করেন। লায়ন রকের উপর রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ নির্মিত হয় এবং রকের পশ্চিম দেওয়াল বর্ণময় ফ্রেসকো দিয়ে চিত্রিত হয় যার মধ্যে বেশ কিছু ফ্রেসকো এখনও বিদ্যমান। ফ্রেসকোয় চিত্রিত মেয়েদের অঙ্গে বিবিধ অলংকার। গাত্রবর্ণ লাল, হলুদ এবং সবুজ। মনে করা হয় এগুলি তৎকালীন রানিদের ছবি, সঙ্গে তাঁদের সহচরীরা। অনেকে মনে করেন এগুলি দেবী তারার একাধিক রূপের প্রকাশ যাঁকে মহাজন বৌদ্ধরা পুজো করতেন। রাজা কাশ্যপের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই রাজা মুগালন সিগিরিয়া রাজপ্রাসাদ বৌদ্ধসঙ্ঘকে দান করে দেন। ১৪০০ শতাব্দী পর্যন্ত এখানে বৌদ্ধ মঠ ছিল।

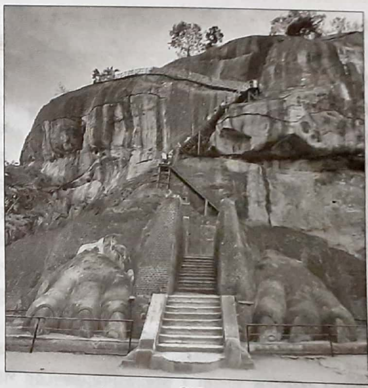

লায়ন রকের সিঁড়ি, সিগিরিয়া

মিউজিয়াম থেকে প্রায় কয়েকশো মিটার দূরে সিগিরিয়ার লায়ন রক। নান্দনিক সেই পথের শোভা। চলতে চলতে মনে হবে যেন প্রাচীন কোনও রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলেছি। দূর থেকে লায়ন রকের হাতছানি এক অমোঘ আবেদন তৈরি করে। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলাম রকের কাছে। রকের নিচে একাধিক গুহা, যেগুলি ভিক্ষুদের বাসগৃহ হিসাবে ব্যবহৃত হত। তার কিছু নিদর্শন এখনও বিদ্যমান। বেশ কিছু বাগান রয়েছে যেগুলি পৃথিবীর প্রাচীনতম বাগানগুলির অন্যতম।

রকে ওঠার বারোশো সিঁড়ি, কিছু পাথরের কিছু লোহার। মাঝে মাঝে প্রশস্ত প্ল্যাটফর্ম আছে বিশ্রামের জন্য। দুশো মিটার উঁচু পাথরের উত্তর দিকে মাঝবরাবর এমনই এক প্রশস্ত প্ল্যাটফর্মের পাশে পাথরের গায়ে খোদিত রয়েছে সিংহের নখরযুক্ত থাবা। এটাই মূল প্রবেশদ্বার। সত্যিই রাজকীয়। মনে করা হয় যে পুরো পাথরটাকেই সিংহের আকৃতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু উপরের অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে এই নখরযুক্ত থাবাটিই শুধু অবশিষ্ট রয়েছে। সিঁড়িতে ওঠার সময় নজরে পড়ে পাথরের গায়ে চিত্রিত রঙিন ফ্রেসকোগুলি। তাছাড়া নজর কাড়ে রকের মিররওয়ালের গ্রাফিটি। মিররওয়াল এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য। কথিত, এই মিররওয়াল এতটাই পালিশ করা থাকত যে রাজা নিজের চেহারা দেখতে পেতেন। বিভিন্ন সময়ে ভ্রমণার্থীদের লেখা বিভিন্ন প্রশস্তি ও কবিতা মিররওয়ালকে সমৃদ্ধ করেছে। অবশ্য এখন সব নিষিদ্ধ। সবচেয়ে পুরনো যে-প্রশস্তি এখানে পাওয়া যায় তা ষষ্ঠ শতাব্দীর। এ-ঘটনা নির্দেশ করে যে সিগিরিয়া প্রাচীনকাল থেকেই ভ্রমণপিপাসুদের গন্তব্য ছিল।

লায়ন রকের একেবারে ওপরে মালভূমির মতো অঞ্চল। সেখানে রাজা কাশ্যপ (প্রথম) নির্মিত প্রাসাদ ও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, রাজাদের স্নানের সুইমিং পুল, নাচ দেখার জন্য নির্মিত রাজা-রানির

Scanned by CamScanner

বসার পাথরের সিংহাসন আজও বিদ্যমান। এসব দেখে মনে বিস্ময় জাগে। এখানকার প্রাসাদ ও দুর্গের অংশটি প্রাচীন নগর পরিকল্পনার এক সার্থক উদাহরণ। রকের ওপর থেকে নিচের দৃশ্য অনিন্দ্যসুন্দর। এ যেন প্রকৃতি, প্রযুক্তি ও শিল্পের এক অনবদ্য মেলবন্ধন। আসার দিন কলম্বো বিমান বন্দরে প্রচুর বিদেশি দেখে মনে হয়েছিল এঁরা কোথায় যাবেন। আজ উত্তর পেলাম। রকের ওপর একশো জন ভ্রমণার্থী থাকলে তার ত্রিশ শতাংশই বিদেশি। রকে অনেকটা সময় কাটিয়ে নামতে শুরু করলাম। যত সময় নিয়ে উঠেছি নামতে তার অর্ধেকেরও কম সময় লাগল। ফিরে চলেছি। বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। কেবলই মনে হচ্ছে, আহা কী দেখলাম!

ঘড়িতে বেলা দেড়টা। দুপুর হয়ে গেছে। তার ওপর চব্বিশশো সিঁড়ি ওঠানামা। পেটে রাক্ষুসে খিদে। হোটেলে খাওয়া সেরে নিলাম। শেষে ছিল পেঁপের জুস। সে-স্বাদ ভোলার নয়।

সিগিরিয়া থেকে চলেছি বিমানবন্দরের উদ্দেশে। আকাশ আরও কালো হয়ে এসেছে। পথে পড়ল ডাম্বুলা। ডাম্বুলা স্বর্ণমন্দির বিখ্যাত কিন্তু সেটি আমাদের রাস্তায় পড়বে না। দু-তিন কিলোমিটার ভিতরে ঢুকতে হবে। ড্রাইভারের সঙ্গে পাঁচশো টাকায় রফা হল। গাড়ি ঘুরিয়ে ডাম্বুলা শহরে ঢুকলাম। সোনার পাতে মোড়া ধর্মচক্রমুদ্রায় আসীন বুদ্ধমূর্তি। ১১.৩৬ মিটার উঁচু এই মূর্তি এদেশে দীর্ঘতম। মূর্তিটি ডাম্বুলা স্বর্ণমন্দিরের তিনতলা মিউজিয়ামের মাথায় বসানো রয়েছে। ডাম্বুলা ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন ক্যামেরা প্যান করে টিভিতে এ-মূর্তি বারবার দেখানো হয়। কিন্তু সামনাসামনি দেখা এক অনন্য অভিজ্ঞতা। ডাম্বুলাও ইউনেস্কো হেরিটেজ স্পট। এখানকার গুহামন্দিরের চিত্রকলা, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

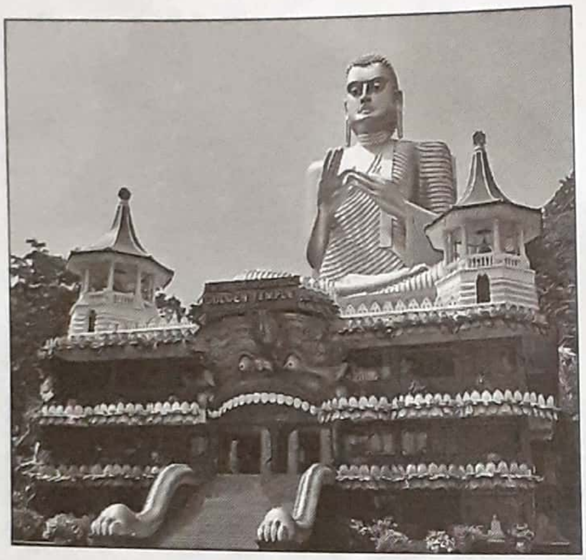

বুদ্ধমূর্তি, ডাম্বুলা

ডাম্বুলা থেকে গাড়ি ছাড়তেই শুরু হল বৃষ্টি। শ্রীলঙ্কায় বছরে দুবার বৃষ্টি হয় : দক্ষিণ-পশ্চিমে মে-সেপ্টেম্বর মাসে আর উত্তর-পূর্ব শ্রীলঙ্কায় অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি মাসে। এই অংশে নভেম্বরে বৃষ্টি হয়। সৌভাগ্যবশত আমরা গত দুদিন এক ফোঁটাও বৃষ্টি পাইনি। আজ নেমেছে মুষলধারে।

বৃষ্টির মধ্যেই গাড়ির ওয়াইপারে জল কেটে চলেছি বিমানবন্দরের পথে। পিছনে ফেলে যাচ্ছি মিহিনতালে, অনুরাধাপুরা, সিগিরিয়া, ডাম্বুলা; যেখানে পরতে পরতে জড়িয়ে আছে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস, প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক বিস্ময়। যেখানে শায়িত বুদ্ধমূর্তি মনকে প্রশান্ত করে, মন আশ্রয় খুঁজে পায়। যেখানে সুপ্রাচীন শ্রীমহাবোধি সুগভীর ধর্মীয় চেতনার ভাস্বর প্রতিমূর্তিরূপে বিরাজ করে; সিংহগিরি দাঁড়িয়ে থাকে প্রকৃতি, মানবকল্পনা, নগরপরিকল্পনা ও বাস্তুরীতির মহাকাব্যিক সমন্বয়ে। যেখানে স্নিগ্ধ মানুষেরা বাস করেন, যেখান থেকে ফিরে মনে হয় এক শান্তির জায়গা দেখে এলাম।

Scanned by CamScanner